নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১০ আগস্ট ২০১১)

নির্বাচন কমিশন কতগুলো সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংলাপ শেষ করেছে, যদিও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এতে অংশ নেয়নি। কমিশন গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছে। কমিশন কারো সঙ্গেই আলোচনায় বসতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়, তাই আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াও এ গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা কমিশনকে সাধুবাদ জানাই। আর এটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও সমস্যার সমাধান করা হয়। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হলে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

কমিশনের প্রস্তাব ও আমাদের মতামত

সংলাপে নির্বাচন কমিশন দু'টি নতুন আইনের এবং কিছু বিধিমালা সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এগুলো হলো: (১) প্রস্তাবিত *প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন*; (২) প্রস্তাবিত *নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় (জন তহবিল) আইন*; (৩) প্রস্তাবিত *নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিধিমালা*। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) প্রচলনও কমিশনের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অসদাচারণের দায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের শাস্তির বিধানসহ অনেকগুলো নতুন বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধনের প্রস্তাবও সংলাপে আলোচিত হয়েছে।

কমিশনের প্রস্তাব আরও বিস্তৃত আকারে এবং প্রত্যেকটি প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের মতামত একটি ছকের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

কমিশনের সংস্কার প্রস্তাব ও আমাদের মতামত

কমিশনের প্রস্তাব	আমাদের মতামত
১. প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন আইনের খসড়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ তিনজন – যার মধ্যে একজন নারী – কমিশনার সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রমাণিত প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুমিত নিরপেক্ষতাসহ আইনানুগ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে কমিশনে নিয়োগ প্রদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে সৎ বলে বিবেচিত নন এবং বৈধ আয়ের ভিত্তিতে জীবননির্বাহ করেন না, কোনো রাজনৈতিক দলের বা দলের অঙ্গ সংগঠনের সদস্য, দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং ঋণখেলাপী – এমন ব্যক্তিরা কমিশনে নিয়োগ প্রাপ্তির অযোগ্য হবেন। উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার (আহ্বায়ক), সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হাইকোর্টের একজন বিচারক, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব আইনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কমিটি প্রত্যেকটি শূণ্য পদের বিপরীতে তিনজনের একটি প্যানেল প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির কাছে প্রেরণ করবে। কার্য উপদেষ্টা কমিটি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী যার সদস্য, যথাযথ পরীক্ষা ও বিবেচনার পর যে চূড়ান্ত প্যানেল তৈরি করবে তা থেকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করবেন।	কমিশনারদের জন্য নির্ধারিত গুণাবলী কাঙ্ক্ষিত। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রমাণিত প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর জোর দেওয়ার ফলে নিয়োগ যেন শুধুমাত্র সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ফলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ কমিশনারদের সংখ্যা ৫-এ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, কমিশনে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কোনো বিধান পঞ্চদশ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদান সম্পর্কে আমরা একমত। তবে এতে সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটিকে যুক্ত করা ফলদায়ক হবে কি-না তা নিয়ে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ আমাদের বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী একত্রে বসেন না, এমনকি তাঁরা পরস্পরের ছায়াও মাড়ান না, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এছাড়াও আমরা শুনেছি যে, বর্তমান সংসদে এই কমিটি একবারও বসেনি। আমাদের বিকল্প প্রস্তাব হলো স্পিকারের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন, যাতে সরকারি দলের চারজন এবং বিরোধী দলের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। সংসদ নেতা সরকারি দলের এবং বিরোধী দলের নেতা বিরোধী দলের সদস্যদের নাম নির্ধারণ করবেন। এই বিশেষ কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, একজন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং দুইজন নির্দলীয় বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্নয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন এবং কমিটির নাম প্রকাশ করবেন। পঞ্চদশ সংশোধনীতে অনধিক পাঁচজনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে। কিন্তু বর্তমান কমিশন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ তিনজনকে নিয়ে কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছে, যা আমরা সমর্থন করি। অনুসন্ধান কমিটি তিনটি পদের বিপরীতে ছয়জনের নাম বিশেষ সংসদীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব এবং নামগুলো প্রকাশ করবে। বিশেষ সংসদীয় কমিটি তিনটি পদের বিপরীতে তিনজনের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব এবং নামগুলো প্রকাশ করবে। রাষ্ট্রপতি কোনো নামের ব্যাপারে আপত্তি থাকলে তা কারণসহ বিশেষ সংসদীয় কমিটিকে জানাবে। এমন পরিস্থিতিতে সংসদীয় কমিটি বিকল্প নাম প্রস্তাব করবে। কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালনের এবং বিতর্কিত ও কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত ব্যক্তি এবং ঋণ খেলাপীদের প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত না করার প্রস্তাবের সঙ্গেও আমরা একমত। অতীতে অনুসন্ধান বা বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের ভাল নয়। অনেকেরই স্মরণ আছে, প্রথম স্বাধীন দুর্নীতি দমন

	কমিশনে বাছাই কমিটির মাধ্যমে চারদলীয় জোট সরকার ২০০৪ সালে কী ধরনের ব্যক্তিদেরকে কমিশনে নিয়োগ দিয়েছিল! সেসব ব্যক্তিরা কমিশনকে কার্যকর করতে পারেননি। এব্যাপারে অবশ্য সরকারের অসহযোগিতাও বড় ভূমিকা রেখেছিলো। আবার বর্তমান সরকারের আমলেই মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত একজন অধ্যাপকের নাম সুপারিশ করেছিল, রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগও দিয়েছিলেন এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই তাকে পরবর্তীতে অপসারণ করা হয়েছে। তাই বাছাই কমিটির পক্ষ থেকে 'ডিউ ডিলিজেন্স' বা সর্বোচ্চ সর্তকতা প্রদর্শন করতে হবে। লক্ষনীয় যে, ক্ষমতাসীন অওয়ামী লীগ এব্যাপারে তাদের মুখ খোলেনি, যদিও তারা অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যম্যে নিয়োগ প্রদানে আগ্রহী নয় বলে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন বেরিয়েছে (*সমকাল*, ৭ আগস্ট ২০১১)।
২. নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় (জন তহবিল) আইন যেসকল নিবন্ধিত দল পূর্ববর্তী সংসদ নির্বাচনে নিজস্ব প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণকৃত আসনের প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের ৫ শতাংশ পেয়েছে তারা জন তহবিল থেকে শুধুমাত্র কমিশন কর্তৃক নিধারিত খাতে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পূর্ববর্তী নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বর্তমানে নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তারাই কেবল এ সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন। নির্বাচনী ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে তহবিলপ্রাপ্তদেরকে নির্ধারিত ফরমে তহবিলের অর্থ ব্যয়ের একটি রিটার্ন কমিশনে দাখিল করতে হবে, যা মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস কর্তৃক অডিট করানো হবে। কমিশন নিজস্ব তহবিল হতে সংসদ নির্বাচনের পূর্বে 'জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের নির্বাচনী ম্যানুফেস্টো' প্রচারের এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একইমঞ্চে আনার এবং বিতর্ক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। এ সকল আয়োজনে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী দল বা প্রার্থী জন তহবিল প্রাপ্তির অযোগ্য হবে।	প্রস্তাবিত *নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় (জন তহবিল) আইন* সম্পর্কে আমাদের প্রবল দ্বিমত রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ টাকার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে এবং আমাদের জাতীয় সংসদ পরিণত হয়েছে বহুলাংশে ব্যবসায়ীদের ক্লাবে। আমাদের হয়ে গিয়েছে 'বেস্ট ডেমোক্রেসী দ্যাট মানি ক্যান বাই,' অর্থাৎ টাকা দিয়ে কেনা শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র। বস্তুত, টাকার খেলাই আজ আমাদের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তাই নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। তবে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা তা বন্ধ করা যাবে বলে আমরা মনে করি না। বরং সরকারি কোষাগার থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদেরকে নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। তবে ছোট দলগুলোকে 'ইন-কাইন্ড' সহায়তা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরও আলোচনা করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের নির্বাচনী ম্যানুফেস্টো প্রচারের বিষয়টি বোধগম্য নয়। কমিশন সম্ভবত দলের ম্যানুফেস্টোর কথা বুঝাতে চেয়েছে! তবে এ কাজটি দলের ওপর ছেড়ে দেওয়াই সঠিক হবে বলে আমরা মনে করি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরকে একই মঞ্চে এনে বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব আমরা জোরালোভাবে সমর্থন করি। তবে এ ব্যাপারে নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা সুজনে'র পক্ষ থেকে ৮৭টি নির্বাচনী এলাকায় সফলভাবে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। স্থানীয় নির্বাচনেও আমরা এর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছি।
৩. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিধিমালা প্রস্তাবিত *নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিধিমালার* উদ্দেশ্য মূলত দু'টি। প্রথমত, তিনটি পার্বত্য এলাকার প্রত্যেকটির জন্য অন্তত একটি সংসদীয় আসন সংরক্ষিত করে জাতীয় সংসদে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, অদিবাসী তথা আমাদের জনসংখ্যায় বিরাজমান ডাইভারসিটি বা বৈচিত্রের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য জেলাগুলোর জন্য অন্তত দু'টি আসন সংরক্ষণ করা এবং একইসঙ্গে ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার জন্য দশটি আসন নির্ধারিত করা।	আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং সকল জেলার ন্যূনতম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত এ সংরক্ষণ পদ্ধতিকে, যা একটি 'এফারমেটিভ এ্যাকশান,' আমরা সমর্থন করি। তবে আমরা প্রস্তাবিত বিধির ৪ ধারা সংশোধন করে পার্বত্য জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্ব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত রাখার প্রস্তাব করছি। প্রসঙ্গত, প্রকাশ্যভাবে কিছু না বললেও, গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দল এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে (*সমকাল*, ৭ আগস্ট ২০১১)।
৪. ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) প্রচলন কমিশন প্রতিটি সংলাপে ইভিএম ব্যবহারের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে।	ইভিএম প্রবর্তনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য। পৃথিবীর অর্থনেতিক দিক থেকে উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে বিরাজমান 'টেকনলজিক্যাল ডিভাইড' বা প্রযুক্তিগত বিভক্তি দূর করতে হলে নির্বাচনী ব্যবস্থাসহ সকল ক্ষেত্রে আমাদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রতিবেশিসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই ইভিএম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বিরাজমান বিরোধীতার-খাতিরে-বিরোধীতার রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির কাছে প্রস্তাবটি জিম্মি হয়ে গিয়েছে। তাই আমরা কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেও, আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমত্য সৃষ্টির আগে ইভিএম প্রবর্তন না করার পক্ষে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা আগামী সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোতে এ পদ্ধতি পরীক্ষামূলক ব্যবহারের সুপারিশ করছি।
৫. সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এ সংশোধন অসদাচারণের অভিযোগে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের শাস্তির বিধান সংশোধনের লক্ষ্যে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৭(৬) ধারায় পরিবর্তন এনে অসদাচারণে লিপ্ত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী	এ প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করি। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অসদাচারণে লিপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করতে হলে কমিশনকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হয়। প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হলে কমিশন নিজেই তাদেরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে

বাহিনীর সদস্যদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৭ ধারায় ৭ ও ৮ উপ-ধারা যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।	পারবে। তবে আমদের বিরাজমান ব্যাপক ও নগ্ন দলীয়করণের প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত এ বিধান কতটুকু কার্যকর করা যাবে সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। কারণ জাতীয় নির্বাচনে ১০ লক্ষাধিক সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যুক্ত করতে হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের ফলে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অধিকাংশ কর্মকর্তাই ক্ষমতাসীন দলের প্রতি অনুগত হবেন বলে আমাদের আশঙ্কা, যা কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া আরপিও'র ৯২ ধারার সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের জন্য দায়মুক্তির বিধানেরও অপব্যবহারের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। তাই আমরা নির্বচনী কর্মকর্তাদের 'ব্লাঙ্কেট' দায়মুক্তি প্রদানের বিপক্ষে।
আরপিও-র ১২ ধারায় সংশোধন এনে কোনো আদালত ও ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পলাতক ঘোষিত, মনোনয়নপত্র বা হলফনামায় সজ্ঞানে মিথ্যা তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপনকারী, এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাকুরিরতকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।	এসব বিধান আমরা সমর্থন করি। তবে মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদালত ও ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পলাতক ঘোষিত ব্যক্তিকে সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য করা রাজনৈতিকভাবে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।
নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলা সম্পর্কিত আরপিও'র 44BB(a) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (১৪ ধারা)।	আমরা এ প্রস্তাব সমর্থন করি।
ইভিএম প্রবর্তনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (২৬ ধারা)।	আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এর পরীক্ষামূলক ব্যবহারের আমরা সুপারিশ করছি।
নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখের পরিবর্তে ২৫ লাখ টাকা করা হয়েছে (44B ধারা)।	আমরা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে। তবে অর্থের অপব্যবহার আমাদের রাজনীতিকে ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত করে ফেলেছে। তাই নির্বাচনে অর্থের প্রভাব কমানোর উপায় আমাদের খুঁজতে হবে।
'ট্রু' বা সত্যিকারের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার বিধান করা হয়েছে (44C ধারা)।	ভাল প্রস্তাব, তবে এটিকে কার্যকর করার জন্য নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব যাচাই করার লক্ষ্যে কমিশনের সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে এবং কমিশনকে হিসাব যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হবে। আমরা এ প্রস্তাবের বিপক্ষে।
দলীয় মনোনয়নে ৫১ থেকে ১০০ জন সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এমন দলের সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা ৭৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা করা হয়েছে (44C ধারা)।	দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে, নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাধীনভাবে বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি হবে। তাই তাৎক্ষণিক বিচারের আশায় এ পরিবর্তন আনা হলেও, এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কা রয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করি।
আরপিও'র ৭৩, ৭৮, ৭৯ ও ৮০ নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি কমানো হয়েছে, যাতে এগুলোর বিচার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়।	
হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদানের দায়ে, নির্বাচন পরবর্তীকালে নির্বাচন বাতিলের বিধান যুক্ত করা হয়েছে (90F ধারা)।	

আমাদের অতিরিক্ত সুপারিশ

কমিশনের উপরিউক্ত প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা কতগুলো নতুন বিষয় সংযোজন করতে চাই: (১) গত জাতীয় নির্বাচনে 'না ভোটে'র বিধান কার্যকর থাকলেও, নবনির্বাচিত সংসদ আরপিও থেকে এটি বাদ দেয়। আমরা না ভোটের বিধান আরপিও'তে সংযোজিত করার প্রস্তাব করছি।

(২) গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সংশোধিত আরপিও'র বিধানানুযায়ী, নিবন্ধিত দলের তৃণমূলের কমিটিগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি প্যানেল থেকে দল কর্তৃক মনোনয়নের বিধান ছিল। কিন্তু নবম সংসদ এটি রহিত করে প্যানেলটি শুধু বিবেচনায় নেওয়ার বিধান আরপিও-তে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে দলের তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রভাবিত করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়, যদিও এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য নেই। দলের সদস্যদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা আরপিও'র 90B(1)(b)(iv)-এর সংশোধন করে এ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করছি।

(৩) আমাদের উচ্চ আদালত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আদালত প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে বাক্ স্বাধীনতা তথা মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়াও *পিইউসিএল ও অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া* মামলার রায়ে [(২০০৩) ৪ এসসিসি] অদালত স্বীকৃতি দিয়েছে যে, ভোটারদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না, নিরপেক্ষও না। তবে তথ্য দিলেই হবে না, তথ্য সঠিক ও বিভ্রান্তিমুক্ত হতে হবে। তাই নির্বাচন কমিশনের চূলচেরাভাবে তথ্যের সঠিকতা যাচাই করারা আমরা প্রস্তাব করছি। আর সৎ-যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত না হয়ে আসলে নির্বাচন অর্থবহও হবে না।

(৪) সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো এগুলো ভোটারদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের দিন থেকে নির্বাচনের দিনের সময়ের ব্যবধান মাত্র সপ্তাহ দুই। এ সীমিত সময়ের মধ্যে প্রায় দুই হাজার প্রার্থীর তথ্য সংকলিত করে ভোটারদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া প্রায়

অসম্ভব কাজ, যদিও গত নির্বাচনের সময় 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাব্রতীরা এ দুঃসাহসিক কাজটি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু কাজটি নির্ভুল ও আরও ভালভাবে করার জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমরা মনোনয়নপত্র, হলফনামা, নির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাবসহ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টগুলো ইলেকট্রনিক্যালি (অন-লাইনে) জমা দেওয়ার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। আরও সুপারিশ করছি 'কাউন্টার এফিডেভিট' বা বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করার। প্রসঙ্গত, বিরুদ্ধ হলফনামা প্রদানের বিধানটি নির্বাচন কমিশনের ১৭/১১/০৮ তারিখে জারি করা পরিপত্র- ৮ দ্বারা গত সংসদ নির্বাচনে কার্যকর করা হয়।

(৫) *জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪* সংশোধন করে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে আরপিও'র ১২ ধারার অন্তর্ভুক্ত অনুরূপ হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের কপি জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। হলফনামার ছকটিও নতুন করে তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও আমরা মনে করি।

(৬) আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যক। আরপিও'র ১২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত কিছু সীমাবদ্ধতা – যেমন ইস্তফাদানকারী বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ইস্তফাদানের বা অবসরের পর তিনবছর অপেক্ষা, মনোনয়ন লাভের জন্য দলে যোগদানের পর তিনবছর অপেক্ষা ইত্যাদি – মানসম্মত প্রার্থী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে বলে আমাদের ধারণা। আর এ সুযোগে ব্যবসায়ীরা আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন দখল করে নিয়েছে। তাই এ সকল বাধা-নিষেধের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শনের বিষয়টি আজ গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। এছাড়াও এসব বাধা-নিষেধ নতুন ও ছোট দলগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর মনোনয়ন লাভের জন্য তিনবছর অপেক্ষা করার বিধান অব্যাহত থাকলে দলের পক্ষ থেকে তাদের সদস্যের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(৭) বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্বও কমিশনের ওপর অর্পন করার সুপারিশ করছি। এ জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

(৮) রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব (অনুচ্ছেদ-১১৯)। এর জন্য কমিশনকে স্বাধীনতা দিতে হবে, বিশেষত আর্থিক স্বাধীনতা, যাতে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে না হয়। এজন্য কমিশনের ব্যয়কে 'সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয়' হিসেবে গণ্য করা আবশ্যক। তবে এ জন্য সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আবশ্যক

প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো তৈরি, কমিশনে যথাযথ ব্যক্তির নিয়োগ প্রদান এবং কমিশনকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হলেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত নয়। এর জন্য আরও প্রয়োজন আমাদের বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন। আর তা বহুলাংশে নির্ভর করবে আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর। তবে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক দল গড়ে না উঠলে এমন সদিচ্ছার আশা দূরাশাই থেকে যাবে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে বড় বাধা হলো: দলীয়করণের কারণে প্রশাসনের নিরপেক্ষতাহীনতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্র বিশেষে পক্ষপাতিত্ব, নির্বাচনে টাকার খেলা ও পেশিশক্তির প্রভাব, প্রার্থীদের ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নির্বাচনে জেতার মানসিকতা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এসবগুলো সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নয়। অতীতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় সরকারের রেখে যাওয়া দলীয় অনুগতদের দিয়ে তৈরি 'সাজানো বাগান' ভেঙ্গে দিত এবং নতুন পদায়িত কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করত। কিন্তু একটি জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো 'পাহারাদারের' ভূমিকা পালন করা কমিশনের পক্ষে অসম্ভব। এটি কমিশনের দায়িত্বও নয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা ছাড়া কমিশনের পক্ষে এককভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা ছাড়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না।

তবে এসব সমস্যার অধিকাংশের সমাধানই রাজনৈতিক দলের হাতে। তারাই টাকা ও পেশিশক্তি ব্যবহার করে। টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, দল কেনা-বেচা করে, ভোট কেনে, কর্মকর্তাদের উৎকোচ প্রদান করে ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরাই পেশিশক্তি ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে হুমকি দেয়, ভোটারদের ভোট কেন্দ্র আসা থেকে বিরত করে, নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে জালিয়তির আশ্রয় নেয়। এককথায়, তারাই অধিকাংশ নির্বাচনী অপরাধের উৎস। এছাড়াও তারাই প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বহিনীকে দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রে লিপ্ত করে। তারা নিজেরা ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন (যেমন দলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অঙ্গ সংগঠন ও বিদেশী শাখা বিলুপ্তি ইত্যাদি) অমান্য করে। তাই রাজনৈতিক দলগুলো সদাচারণ করেতে বদ্ধপরিকর হলে নির্বাচনে নিরপেক্ষতার সমস্যা বহুলাংশে দূরীভূত হয়ে যাবে। নির্বাচন কমিশনকে আর তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত 'ক্যাট এণ্ড মাউস' খেলায় লিপ্ত হতে হবে না। তাই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের 'বল' আজ বহুলাংশে রাজনৈতিক দলের কোর্টে।

পরিশেষে, একথা সুস্পষ্ট যে, আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রপথের আজ সর্বাধিক বড় চ্যালেঞ্জ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদলের পথ কন্টকমুক্ত করা। কারণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের পথ রুদ্ধ হলে আমরা চরম সঙ্কটের দিকে ধাবিত হতে পারি, যা কারোরই কাম্য নয়। কতগুলো সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্যোগটির জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ, যদিও আমরা মনে করি যে, কমিশনের প্রস্তাবে কিছু সংযোজন-বিয়োজন প্রয়োজন। আমরা আশা করি যে, বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের করণীয় করার জন্য এগিয়ে আসবে। বিশেষত ক্ষমতাসীন অওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কমিটি গঠন ও সংস্কার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করবে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়েজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপিত (১১/০৮/১১)